“সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তার প্রতিকার” – ভগৎ সিংয়ের দৃষ্টিতে যুবসমাজের ভূমিকা

সরোজ দাস

১৯২৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত ভগৎ সিংয়ের প্রবন্ধ “সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তার প্রতিকার” শুধু সেই সময়ে নয়, আজকের ভারতের জন্যও এক প্রাসঙ্গিক দর্পণ। উপনিবেশিক শোষণ, ধর্মীয় উন্মাদনা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই রচনা কেবল একটি বিশ্লেষণই নয়, বরং এক বিপ্লবী দর্শনের হাতিয়ার। আজ, যখন দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নতুন ঢেউ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ও অর্থনৈতিক সংকট গভীর হচ্ছে, ভগৎ সিংয়ের চিন্তা নতুন করে ভাবনার দাবি রাখে।

ঔপনিবেশিক শেকল ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনা, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, স্বদেশী আন্দোলনের ধারা দানা বাঁধতে শুরু করে। ব্রিটিশরা জানত, যদি ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে শাসন করা কঠিন হবে। তাই তারা “Divide and Rule” (বিভাজন ও শাসন) নীতি অনুসরণ করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়, যার মধ্যে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ছিল

অন্যতম। এর পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, যাতে তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। বাংলার হিন্দু-মুসলমানরা একজোট হয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নেয়। চরমপন্থী ও বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থান ঘটে। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করতে বাধ্য হয় কিন্তু এটি আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বীজ বপন করে।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন কৌশল নিয়ে ব্রিটিশরা মুসলিম সমাজের মধ্যে পৃথক রাজনৈতিক সত্ত্বার ধারণা তৈরী করে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯০৬ সালে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। অন্যদিকে, ১৯১৫ সালে হিন্দু মহাসভার গঠনও ব্রিটিশদের এই নীতির পরোক্ষ ফল। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হিন্দু মহাসভা সক্রিয় হয়ে ওঠে, যা ভারতীয় রাজনীতিকে আরও বিভাজিত করে তোলে। ব্রিটিশ সরকার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ১৯০৯ ও ১৯১৯ সালের ধর্মীয় পরিচিতির প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করে, যা হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। পরবর্তীতে ১৯২৩-২৭ সালের নাগপুর, কলকাতা ও লাহোরের রক্তস্নাত দাঙ্গা সেই বিভাজনকেই চিরস্থায়ী করেছিল। ভগৎ সিং লক্ষ্য করেছিলেন, এই দাঙ্গাগুলি কোনো "স্বতঃস্ফূর্ত" সংঘাত নয়, বরং শাসক শ্রেণির সুপরিকল্পিত কৌশল–যা ভারতীয়দের প্রকৃত শত্রু (ব্রিটিশ শোষণ) থেকে মনোযোগ সরিয়ে ধর্মের নামে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করতে বাধ্য করেছিল।

অর্থনীতি ও ধর্মের সম্পর্ক-এ ভগৎ সিংয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আজকের ভারত

ভগৎ সিংয়ের বিশ্লেষণের মর্মকথা ছিল মার্কসবাদী দর্শন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাম্প্রদায়িকতার মূলে রয়েছে তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ ও শ্রেণীসংগ্রামের দুর্বলতা। তিনি মনে করতেন, সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ বিদ্যমান থাকলে সাধারণ মানুষ তাদের অসহায়তার কারনেই সহজে ধর্মীয় উস্কানির শিকার হয়। ব্রিটিশ সরকার কৌশলে জমিদারি ব্যবস্থা ও শিল্পবিরোধী নীতি বজায় রেখে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণিকে নিঃস্ব করে দেয়। ফলস্বরূপ, তারা ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং শোষকদের প্রকৃত চেহারা বুঝতে ব্যর্থ হয়।

১৯২৮ সালের লাহোর দাঙ্গার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন যে, সেখানে হিন্দু, শিখ ও মুসলমান একে অপরকে হত্যা করেছিল, কিন্তু কেউই বুঝতে পারেনি যে আসল শত্রু ছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং পুঁজিপতি শ্রেণি। এই দাঙ্গাকে তিনি দেখেছিলেন শ্রেণিসচেতনতার অভাবের ফল–যেখানে শোষিতরা নিজেদের আসল শত্রু (শোষক শ্রেণি) চিনতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর মতে, সাম্প্রদায়িকতার একমাত্র প্রতিষেধক হলো শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা গড়ে তোলা। তিনি রাশিয়ার উদাহরণ টেনে বলেছিলেন, সেখানে শ্রমিক বিপ্লবের পর ধর্মীয় দাঙ্গা বন্ধ হয়েছিল, কারণ মানুষ নিজেদের "শ্রমিক" পরিচয়ে চিনতে শিখেছিল।

তিনি লিখেছিলেন, "ক্ষুধার্ত মানুষ ধর্মের নামে লড়াই করে, কারণ তার পেটের ক্ষুধাই তাকে অন্ধ করে দেয়"। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, প্রকৃত সমস্যা ধর্ম নয়, বরং অর্থনৈতিক অসাম্য। তিনি আরও বলেন, "যে দিন মানুষ ধর্মের নামে লড়াই ছেড়ে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য লড়বে, সে দিনই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হবে"।

আজকের দিনে দাড়িয়েও ভারতে একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গল্প বলা হচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ বেকারত্ব, দারিদ্র্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংকটের মতো গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ২০% মানুষ

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। শীর্ষ ১% ধনী জনগোষ্ঠীর কাছে দেশের মোট সম্পদের ৪০% রয়েছে, যেখানে নিম্ন ৫০% জনগণের কাছে মাত্র ৩% সম্পদ। মুদ্রাস্ফীতি, কম মজুরি, ও প্রয়োজনীয় পরিষেবার মূল্যবৃদ্ধির কারণে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

বর্তমান যুবসমাজের বড় অংশ কর্মসংস্থানের অভাবে দিশেহারা। বেকারত্বের হার ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (CMIE)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে বেকারত্বের হার ছিল ৭.৮%। প্রযুক্তির অগ্রগতি, স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ব্যবহার ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমিত নিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান সংকুচিত হচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নীতিগুলোর ফলে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও সম্পদ বেসরকারিকরণের মাধ্যমে ধনীদের আধিপত্য আরও সুসংহত হচ্ছে, কিন্তু যুবসমাজ কাজের সুযোগ পাচ্ছে না।

বিজেপির সরকার জনগণের আসল সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি সরাতে ধর্মীয় মেরুকরণকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। সরকারের পক্ষ থেকে ইতিহাস বিকৃতি, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি এবং বিভাজনমূলক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও কার্যক্রমকে রাজনৈতিক এজেন্ডার অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ, অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কুম্ভ মেলাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা খবর প্রচার-যাতে যুবসমাজ সহজেই প্রভাবিত হয়। একদিকে RSS পরিচালিত বিজেপি সরকার সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাকে অমান্য করে হিন্দু-রাষ্ট্র গঠনের নামে হোক কিমবা "হিন্দু খতরতে মে হে" - এই স্লোগানের তলায় উগ্র হিন্দুত্ববাদ প্রচার করছে। অপরদিকে এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ AIMM, জামাতের-এর মত উগ্র মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন গুলিও সংখ্যা লঘু মানুষকে সহজে বিভ্রান্ত করে ভারতীয় রাজনীতিকে আরও বিভাজিত করে তুলছে। এযেন ঠিক ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ব্রিটিশদের "Divide and Rule" (বিভাজন ও শাসন) নীতির অনুকরণ।

মিডিয়ার ভূমিকায় অতীত ও বর্তমানের মিল

মিডিয়ার ভূমিকা নিয়েও ভগৎ সিংয়ের সমালোচনা আজকের সংবাদমাধ্যমের জন্যও সতর্কবার্তা। ১৯২৮ সালে তিনি লিখেছিলেন, "সংবাদপত্রগুলি গুজব ছড়িয়ে ঘৃণার বীজ বপন করে"। ব্রিটিশ শাসনের সময় অনেক সংবাদপত্র সরকারপন্থী ছিল এবং তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে অবস্থান নিত। ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ রক্ষার্থে তারা সত্যকে বিকৃত করত এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করত।

একবিংশ শতাব্দীতে সোশ্যাল মিডিয়া ও সেন্সেশনালিস্ট টিভি চ্যানেলগুলিও গুজব ছড়ানো, বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ, এবং বিদ্বেষমূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান মিডিয়ার বড় অংশই কর্পোরেট মালিকানাধীন, ফলে বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যম তাদের মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে সরকারপন্থী প্রচার যন্ত্রে পরিণত হয়ছে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা ও সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মিডিয়া ও টিভি চ্যানেলগুলিতে "করোনা জিহাদ" বা "তবলিগি জামাত" এর মতো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ইস্যুতে সংবেদনশীল সংবাদ পরিবেশন প্রাধান্য পাচ্ছে। "বুলডোজার রাজনীতি"-র নামে গরীব-শ্রমজীবী মুসলিম মানুষের সম্পত্তি ধ্বংসের ভিডিওকে "ন্যায়ের বিজয়" বলে প্রচার করা হচ্ছে–যেন সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও ভগৎ সিংয়ের কথার প্রতিধ্বনি।

নওজোয়ান সভার উত্তরাধিকার থেকে আজকের সংগ্রাম

ভগৎ সিং শুধু তাত্ত্বিক বিপ্লবী নন, তিনি ছিলেন যুব শক্তির সংগঠক। ১৯২৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নওজোয়ান ভারত সভা–যার লক্ষ্য ছিল যুবকদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা, শ্রেণীসংহতি ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা গড়ে তোলা। এই সংগঠন লাহোর দাঙ্গা (১৯২৭) রোধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, হিন্দু-মুসলিম যুবকদের নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করে। ভগৎ সিংয়ের ডাক ছিল- "যুবকরা যদি জাগে, তবে অন্ধকার ঘুচবেই"।

আজকের যুবসমাজের সামনে চ্যালেঞ্জও একই, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মোকাবিলা ও শ্রেণীসংহতি। ভারতে ২০২০-২১ সালের কৃষক আন্দোলন, ২০১৯-২০ সালের সিএএ-বিরোধী লড়াই, এই দর্শনেরই প্রতিফলন–যেখানে শিখ, হিন্দু, মুসলিম সব ধর্মের মানুষ বিশেষ করে একটা ব্যাপক অংশের যুবযমাজ এক হয়ে কর্পোরেটের স্বার্থবাহী আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। "বেসরকারিকরণ"-এর প্রতিবাদে যুবসমাজ আজ রাস্তায় নেমে লড়াই করছে। নওজোয়ান সভার উত্তরসূরি হিসেবে আজকের DYFI ধারাবাহিকভাবে সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজের দাবিতে আন্দোলন করে চলেছে।

আগামী দিনে সরকারের এই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের কর্তব্য হবে ধর্মীয় পরিচয়ে নয় – যুব সমাজকে রুটি-রুজির প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ করা এবং পাড়া-মহল্লায় "সেক্যুলার ফোরাম" তৈরি করে, এই দাঙ্গাবাজ শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করা।

ভগৎ সিংয়ের লেখা শুধু অতীতের দলিল নয়, এটি ভবিষ্যতের জন্য এক রোডম্যাপ। তাঁর কথায়, "সাম্প্রদায়িকতা শোষণের ছায়ামাত্র"। আজও, যখন দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িকতা, বেকারত্ব, ও কর্পোরেট শাসনের ত্রিমুখী সংকটে জর্জরিত, তখন শ্রেণীসংহতি ও ধর্মনিরপেক্ষতাই পারে এই ছায়া দূর করতে। ১৯২৮ সালের লাহোর আর ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার মধ্যে পার্থক্য সামান্য–কেবল শোষকের চেহারা বদলেছে। ভগৎ সিংয়ের ডাক তাই আজও প্রাসঙ্গিক "প্রকৃত শত্রুকে চিনো– সে তোমার ধর্মের নয়, সে তোমার শ্রেণীর"। "সব পেটে ভাত আর সব হাতে কাজ"-এর প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-ইশাহী সব ধর্মের গরীব মানুষের স্বার্থ এক হতে বাধ্য, সেখানে কোথাও পারস্পরিক বিরোধ নেই। শ্রেণী চেতনার আলো জ্বালাতে পারলেই ধর্ম নিয়ে রাজনীতির কারবারিদের জব্দ করা সম্ভব। এই চেতনায় উজ্জীবিত হওয়াই হবে ভগৎ সিংয়ের অসমাপ্ত বিপ্লবের ডাক।